NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

নেহরু বাল পুস্তকালয়

বাপু

(প্রথম খণ্ড)

এফ, সি, ফ্রিটাস্



ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

নেহরু বাল পুস্তকালয়—১

বাপু

(১ম খণ্ড)

লেখা ও ছবি ঃ

এফ, সি, ফ্রিটাস্

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নিউ দিল্লী

জুলাই ১৯৭০ (শ্রাবণ ১৮৯২)

BAPU
Part I
(Bengali)



সচিব, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী-১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত। ছবি ও প্রচ্ছদপট ইন্দ্রপ্রস্থ প্রেস (সি-বি-টি) নিউ দিল্লী থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

লোকের মনে বই পড়ার ইচ্ছা জাগাবার জন্যই ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট স্থাপিত হয়েছে। বইয়ের মেলা ও প্রদর্শনী দিয়ে, কম দামে ভালো ভালো বই প্রকাশ করে, নানান উপায়ে এঁরা এই কাজ করার চেষ্টা করেন।

আমাদের দেশে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের পড়ার মতো বই খুব বেশি নেই। দেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে অনেকদিন ধরেই সকলে এই অভাব বোধ করেছেন। যে কয়টি ভালো বই বেরিয়েছে, তার দাম খুব বেশি। সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েরা সে-সব কিনতে পারে না। যাতে নিজেদের হাত-খরচের টাকা দিয়ে তারা ভালো বই কিনতে পারে, তাই সরকার এবার বই ছাপার কাজ আরম্ভ করেছেন। নিজেদের মনের মতো বই কেনার পয়সা তাহলে আর কারো কাছে চাইতে হবে না।

ভারতবর্ষ একটা বিশাল উপ-মহাদেশ। তার মধ্যে অনেক রাজ্য, অনেক ভাষা। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই শুধু স্থানীয় ভাষায় লেখা বই পাওয়া যায়। কাজেই তামিলনাড়ুর ছেলেমেয়েরা পাঞ্জাবের ছেলেমেয়েদের বিষয় জানার খুব কম সুযোগ পায়। আবার উল্টোটাও সত্যি। অথচ সবাই এক-ই দেশের অধিবাসী। ভারতের সব রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যদি এক-ই বই পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে তারা পরস্পরকে জানতে পারবে। ফলে তাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও যুব-কল্যাণ সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টকে নেহরু বাল পুস্তকালয়ের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করার ভার দিয়েছেন। পাঠ্য তালিকার পরিপূরক হিসাবে এই সব বই, একই সময় ভারতের সব ভাষায় প্রাকাশিত হবে। নানান বয়সের পাঠকের উপযোগী বই বেরুবে। নাম করা লেখকরা এসব বই লিখবেন। প্রচুর ছবি থাকবে।

মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবনী দিয়ে এই পুস্তকখানা প্রকাশের কাজ শুরু হল। এটা গান্ধীর শতবর্ষ পূর্তির বছর। আমার মনে হয় তোমরা এই বইটি আর এর পরে যত বই প্রকাশিত হবে, সব-ই উপভোগ করবে।

নিউ দিল্লী
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।

বি, ভি, কেশকর



আঠারো শো আটাত্তর খৃষ্টাব্দ। একদিন যে দিল্লী শহর বড় বড় রাজ্যের, বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, সেই দিল্লীতে আবার মহা ধুম পড়ে গেছে। ভারতের নানা রাজ্য থেকে রাজা-মহারাজারা আর নবাবরা এসেছেন। গায়ে তাঁদের দামী দামী পোষাক আর গয়না-গাঁটি। ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি বড়লাট তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছেন। কলকাতা ছিল তখনকার ভারতের রাজধানী।

দরবারের সব আয়োজন শেষ হয়েছে। এ ধরণের দরবার কদাচিৎ হত, তাও কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে। এ দরবারও হচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হল ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা।

আরো অনেকের সঙ্গে রাজা-মহারাজারাও সম্রাজ্ঞীর প্রতি তাঁদের ভক্তি

ও আনুগত্য নিবেদন করলেন। ভারতে বৃটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হক, তাঁরা এই আশাও প্রকাশ করলেন। এ ঘটনার নয় বছর আগে ভারতে একটি রোগা ছেলের জন্ম না হলে নিশ্চয়ই তাঁদের সে আশা পূর্ণও হত।

দরবারের সময় ঐ ছেলে যত্ন করে স্লেটে নামতা লিখছিল আর অন্যান্য ছোট ছেলেদের মতো সেই নামতা মুখস্থ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। কিন্তু ঐ বয়সেই সে নিয়মানুবর্তিতার আর মনের জোরের দাম বুঝতে শিখেছিল। তার সেই প্রচণ্ড মনোবল-ই তাকে পরে স্বদেশ ও দেশবাসীদের মঙ্গলের জন্য, বৃটিশ রাজশক্তির সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে পরাজিত করার ক্ষমতা জুগিয়েছিল।

দিল্লীর দরবারের উনসত্তর বছর পরে, ভারতের বিংশতিতম বড়লাট এ দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর নাম লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সন্তানের নাতি। আর ঐ যে ছোট ছেলেটির কথা বলা হল, তাঁর নাম মোহনদাস গান্ধী। তিনি ছিলেন ভারতের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নেতা।

আজ থেকে একশো বছর আগে পোরবন্দর নামে একটি ছোট শহরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়েছিল। শহরটা যেন কাথিয়াওয়াড়ের সমুদ্রের উপকূল আঁকড়ে রয়েছে। এখন জায়গাটা গুজরাটের মধ্যে পড়েছে।





তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার ছোট মোহনদাস। তাঁর বাবার নাম করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী। মায়ের নাম পুতলীবাঈ। তাঁরা জাতে বৈশ্য। গান্ধী হল বেনেদের পদবী, কিন্তু এই পরিবারের পুরুষরা ছিলেন রাজ-কর্মচারী। তখনকার দিনে কাথিয়াওয়াড়ে অনেক দেশী রাজ্য ছিল।

মোহনদাসের ঠাকুরদাদা ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান। পরে তাঁর বাবাও পর পর পোরবন্দর, রাজকোট ও ধেনকানারের দেওয়ান হয়েছিলেন। কাবা গান্ধী ছিলেন সত্যপরায়ণ, সাহসী ও উদার। মোহনের কাছে বাবাই ছিলেন সুশাসন ও সদাচারের আদর্শ।

মাকেও তিনি তাঁর ধর্মনিষ্ঠার জন্যে ভক্তি করতেন। গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার মায়ের ছিল গভীর ধর্মনিষ্ঠা। তাঁর ছিল সরল বিশ্বাস। এক দিনের জন্যেও তিনি মন্দিরে যাওয়া বাদ দিতেন না।" ছেলেকেও তিনি রোজ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেই থেকেই ছেলের নির্মল শিশুমনে ভগবানের প্রতি অটল গভীর বিশ্বাস জন্মেছিল। এই বিশ্বাস থেকেই পরে তিনি দুঃখে কষ্টে কতবার আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন।

ছোটবেলায় মোহন ভারি লাজুক ছিলেন। সর্বদাই একটা বই নিয়ে তাতে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর দিন কাটত স্কুল ও বাড়ি, এই দুটিকে ঘিরে। বিশেষ করে স্নেহময়ী মায়ের কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। মাকে তিনি বড় শ্রদ্ধা করতেন। মায়ের ধর্মভক্তি আর তাঁর মনকে পবিত্র করার জন্যে পূজা-উপবাস দেখে, গান্ধীর মনও বিস্ময় আর ভক্তিতে ভরে যেত।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর একমাত্র সাধনা ছিল সত্য কথা বলা। তার উপরে তিনি এ-ও শিখেছিলেন যে মন্দের বদলে ভালো করতে হয়।

বর্ষাকালে চতুর্মাস্য ব্রত। মোহনের মা তখন সূর্য না দেখে আহার করতেন না। মোহন আর তাঁর বোন গভীর আগ্রহে সূর্য দেখার আশায় চেয়ে থাকতেন। সূর্য দেখলেই মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে বলতেন, "মা, মা, দিবাকর দেখা দিয়েছেন।"



অনেক দিন মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা থাকত, দেখা যেত না। তখন



ছেলেমেয়ে ছুটির মন নিরাশায় ভরে যেত। কিন্তু শান্ত জননীর ধৈর্যের শেষ ছিল না। তাদের বোঝাতেন, "আজ ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আমি খাই।" বলেই নিজের কাজে মন দিতেন।

মোহনের মা বাবা কখনো স্কুলে কলেজে পড়েন নি। কিন্তু তাঁদের বড়ই ইচ্ছা ছেলে স্কুলে পড়বে। মোহনকে পোরবন্দর ও পরে রাজকোটের স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করা হল। পড়াশুনোয় যে তিনি অসাধারণ রকমের ভালো ছিলেন, তাও নয়। তবে পড়ায় মন ছিল, নিয়মিত ভাবে পড়তেন। শুধু পাঠ্য পুস্তকগুলোই পড়তেন আর তাছাড়া কয়েকটি পৌরাণিক নাটকের বই।

একবার একটা নাটকের দল ঘুরতে ঘুরতে ওদিকে এসেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে মোহনও নাটক দেখতে গেলেন। নাটকের নাম "হরিশ্চন্দ্র"। হরিশ্চন্দ্র রাজা এত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন যে সত্য রক্ষা করবার জন্যে তিনি নিজের স্ত্রীকেও উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। এই নাটক মোহনের মনে বড় লেগেছিল, তাঁর চোখে জল এসেছিল। তখনই ঠিক করেছিলেন



যে যত কষ্টই হক না কেন, হরিশ্চন্দ্রের মতো সৎ ও সত্যপরায়ণ হতে হবে। তাঁর সত্য নিষ্ঠায় কোনো ফাঁকি ছিল না।

একবার মিষ্টার জাইল্‌স্‌ নামে একজন ইংরেজ স্কুল পরিদর্শন করতে এসে, ছাত্রদের বানান পরীক্ষা করছিলেন। মোহন ছাড়া আর সব ছাত্রই পাঁচটি সহজ কথার ঠিক বানান বলল। মোহন 'কেট্‌ল্‌' বানান করতে পারলেন না।

এই বুঝি তাঁর নাম ডুবল, তাই ভেবে মাষ্টার মশাই আকুল হলেন। পরিদর্শকের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি মোহনকে ইসারায় বললেন পাশের ছেলের স্লেট দেখে নিতে। মোহন সোজা সামনের দিকে চোখ রেখে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরিদর্শকের নজর অন্য দিকে থাকা সত্ত্বেও তিনি জোচ্চুরি করলেন না।

তাঁর মনে হচ্ছিল এবার সকলের সামনে মান গেল। তিনি এ-ও জানতেন যে এই নিয়ে ছেলেরা তাঁকে ঠাট্টা করবে। মাষ্টারমশাইও বকবেন। তবু মনে হল জোচ্চুরি করে সত্যের অপলাপ করা যায় না। যা হয় হোক। চুপ করে থাকাই ভালো।

ক্লাসের পর মাষ্টারমশাই মোহনকে বকতে লাগলেন। বাড়ি ফেরার সময় মোহনের মন বড় বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের গভীরে কিসের একটা উত্তাপ, একটা আলো, একটা উৎসাহ আর শক্তিও অনুভব করলেন। বুঝতে পারলেন উচিত কাজই করেছেন।

তখনকার দিনে প্রায় সকলের-ই অল্প বয়সে বিয়ে হত। মোহনের তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা তাঁর সমবয়সী ছিলেন। পরে মোহন বাল বিবাহকে একটা নিষ্ঠুর প্রথা বলে উল্লেখ করতেন। অবশ্য সে সময় আর কোনো উপায় ছিল না।

কস্তুরবা খুবই কর্তব্যপরায়না ছিলেন। কখনো স্কুলে যান নি, লিখতে পড়তে জানতেন না। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। স্বামীকে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। স্বার্থ বলে কিছু ছিল না ; স্বামীর কাজের ভাগ নিতে সর্বদাই তৈরি ছিলেন। এইভাবে কালে তিনি গান্ধীর বড় প্রিয় সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীর জীবনে দুঃখ কষ্টের সময়, তিনিই তাঁকে শক্তি দিতেন।

বিয়ের জন্য পড়াশুনোতে বাধা পড়েছিল। এক বছর নষ্ট হল। মাষ্টারমশাইদের ইচ্ছা ছিল তিনি খুব খেটে খুটে যদি ডবল প্রমোশন পেয়ে যান, তা হলে ক্ষতি পূরণ হয়। মোহন দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশুনো করতে লাগলেন। অনেক কষ্ট করে পাঠ্য বিষয়গুলোকে শিখে ফেললেন। শেষ অবধি সত্যি সত্যি সফল হলেন।





তিনি ছাত্র হিসাবে খুব চটপটে ছিলেন না ; তাড়াতাড়ি মন ঠিক করতে পারতেন না ; তারপর বড়ই লাজুক ছিলেন। তবে যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। শুধু ক্লাসের মধ্যে ভালো ছাত্র হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চাইতেন বলিষ্ঠ চরিত্র আর নিখুঁৎ সুনাম গড়ে তুলতে।

সেই কেট্‌ল্ বানানের ঘটনাটি থেকে তাঁর সত্যপরায়নতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবিশ্যি পরে তিনি সব মাষ্টারমশাইদেরই স্নেহ ও শুভকামনা লাভ করেছিলেন।

সাধারণ খেলাধূলায় তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। খোলা হাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি অনেকটা পথ হাঁটতে তাঁর ভালো লাগত। নিয়ম করে রোজ হাঁটতেন। এটা ক্রমে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সারা জীবন তিনি এই অভ্যাসটি রেখেছিলেন। বলতেন হেঁটেই তিনি উৎসাহ ও বল পান।

এইভাবে মোহন বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

তবু মোহন মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষের মতোই প্রলোভনে পড়ে যেতেন। একবার একটা সোনার মোহর সরিয়েছিলেন। তার পরেই সে কি

অনুতাপ ! প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনো চুরি করবেন না ; আর বাবার কাছে দোষ স্বীকার করবেন। কিন্তু বাবা তখন বড় অসুস্থ। মোহনের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। শেষটা আর থাকতে না পেরে, এক টুকরো কাগজে নিজের অপরাধের কথা লিখে, তার জন্য শাস্তি চাইলেন।

সে চিঠি পড়ে মোহনের বাবার গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল। কাগজটা ভিজে গেল। ছেলের সততা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, ছেলেকে তখনি ক্ষমা করলেন।

পরে মোহন লিখেছিলেন, "সেই দিন থেকে সত্য কথা বলা আমার স্বভাব হয়ে গেল।" সত্যের যে নিজের একটা শক্তি আছে, এ-কথা তিনি কখনো ভোলেন নি।

মোহনের যখন ষোল বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। বাবার শেষ রোগ শয্যায় তিনি তাঁর সেবা করতেন।





বাবাকে একটু আরাম দেবার জন্য মোহন তাঁর পায়ে হাত বুলোতে থাকতেন যতক্ষণ না বাবার চোখে ঘুম আসে। পিতৃবৎসল ছেলে, বাপের সেবা করে মনে তৃপ্তি পেতেন। দুঃখের বিষয়, ঠিক বাবা মারা যাবার সময় তিনি তাঁর বিছানার পাশে ছিলেন না। এই নিয়ে চিরকাল তিনি দুঃখ করতেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় আঠারো বছর বয়সে, আমেদাবাদ থেকে মোহন প্রবেশিকা পাস করলেন। এবার তাঁকে ঠিক করতে হবে কোন দিকে যাবেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা ডাক্তারি পাস করে রুগ্নদের সেবা করেন। কিন্তু বাড়ির লোকদের তাতে মত ছিল না।

শেষে একজন পুরনো বন্ধু ও পরামর্শদাতা প্রস্তাব করলেন মোহনকে আইন পড়তে বিলেতে পাঠানো হোক। বিদেশে যাবার প্রস্তাবে মোহনের আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু মা বড় গোঁড়া, তিনি আপত্তি করতে লাগলেন।

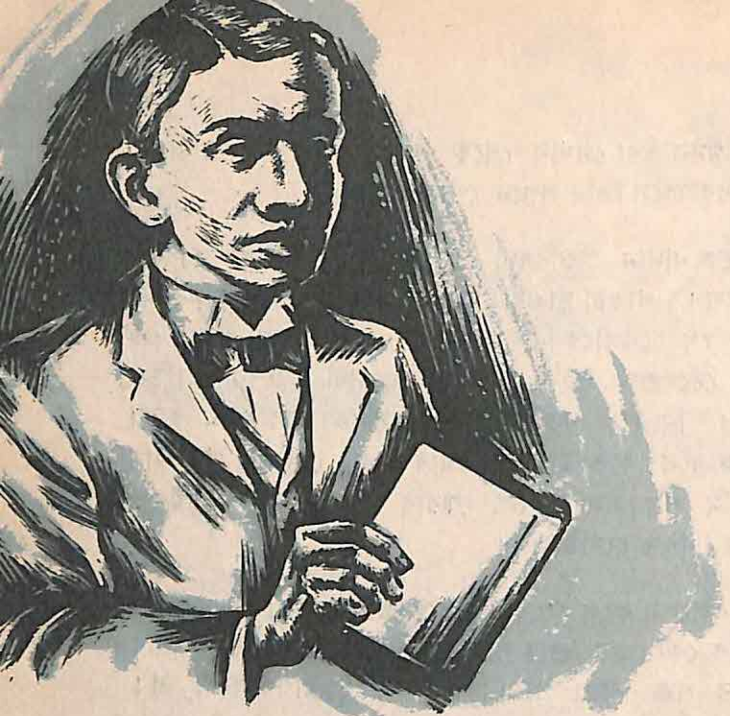
ইংল্যাণ্ডের অদ্ভুত চাল-চলনকে তাঁর বড় ভয়। তার উপর ছেলে সেখানে গিয়ে নানান প্রলোভনে পড়তে পারে। মোহন মাকে অনেক বোঝালেন। শেষ পর্যন্ত কথা দিলেন যে তিনি কখনো মাছ মাংস বা সুরা স্পর্শ করবেন না। মাকে খুসি করবার জন্য মোহন এ বিষয়ে শপথ নিলেন।

তারপর বোম্বাই গমন এবং সেখান থেকে স্টিমার ধরে বিলেত যাত্রা। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি লণ্ডনে পৌঁছলেন।

বিলেতে গিয়ে তাঁকে নানান অসুবিধায় পড়তে হল। বিলিতী কায়দায় জীবন-যাত্রায় বড় মুস্কিল। খাওয়া-দাওয়া নিয়েই মহা সমস্যা। নিরামিষ আহার যদি বা জুটল, সে একেবারে বিস্বাদ। দিন কতক ব্যয়-বহুল এক হোটেলে থাকার পর, দেখেশুনে একটা সস্তা আর ঘরোয়া ধরণের বোর্ডিং-হাউসে গিয়ে উঠলেন। নিজেকে বড়ই একা ও অসহায় বলে মনে হত। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে খেতে রাজি না হবার ফলে, সেই বন্ধু খুব রাগ করে বলেছিলেন, "তুমি ভদ্র সমাজে চলা-ফেরার অযোগ্য।" এই মন্তব্য শুনে মোহন মর্মাহত ও চিন্তিত হয়েছিলেন।

তিনি ঠিক করে ফেললেন হুবহু ইংরেজ ভদ্রলোকদের মতো হতে হবে। খুব কেতা-দুরস্ত পোষাক কেনা হল, তার সঙ্গে চিমনি-টপ্ টুপি আর সোনার চেন ঘড়ি। কিন্তু তাঁর শক্ত খাড়া খাড়া চুল কিছুতেই বাগ মানল না। ফলে চেহারাও কিছুতেই নিখুঁৎ হত না।





এই তো গেল প্রথম পর্ব। এদিকে খাঁটি ইংরেজ ভদ্রলোক হতে হলে নাচ-গান জানা চাই, কইয়ে-বলিয়ে হওয়া চাই। বল-নাচ শিখতে আরম্ভ করলেন। একটা বেহালা কিনলেন, বিলিতী গানের এক মাস্টারও রাখলেন। বক্তৃতা দেবার ও ফরাসী বলার শিক্ষাও চলতে লাগল।

কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও কিছু ফল হল না। বাজনার তালে তালে কিছুতেই পা ওঠে পড়ে না। গান শেখার চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

মাস তিনেক ধরে নকল ইংরেজ ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করে, বুঝতে পারলেন যে এতে নিজেই শুধু বোকা বনছেন। ইংল্যাণ্ডে এসেছেন আইন পড়তে। এভাবে ছায়ার পিছনে ছুটে নিজের বহুমূল্য সময় আর দাদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। এখনি এসব ছাড়া দরকার।

বাস্তবিক তাই করলেন। ফ্যাশান করার চেষ্টা ছাড়লেন। একটা ঘর নিয়ে থাকতে লাগলেন। রোজ সকালে নিজের হাতে পরিজ আর কোকো তৈরি করতেন। দৈনিক খরচ পড়ত এক শিলিং আর তিন পেনি, অর্থাৎ এক টাকার মতো। মন থেকে বাজে দুশ্চিন্তা ঘুচল, প্রাণ আনন্দে ভরল।

এখন মোহন হাতে অনেক সময় পেলেন, বেশি করে পড়াশুনো করতে পারলেন। লণ্ডনের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে, সেটা পাস করলেন। ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা শিখতে লাগলেন। সেই সঙ্গে আইন পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হতে থাকলেন।



খাওয়া নিয়ে তিনি অনেক রকম পরীক্ষা করেছিলেন। ঐ বিষয়ে অনেক পড়াশুনোও করেছিলেন। শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে নিরামিষ খাওয়াই সবচেয়ে পুষ্টিকর। লণ্ডনের নিরামিষ—ভোজীদের সঙ্গে মোহন ভাব করলেন। পাড়ার নিরামিষাশীদের নিয়ে একটা ক্লাবও করলেন। নিজে হলেন তার সেক্রেটারি। তারপরে লণ্ডনের নিরামিষ-ভোজী সংঘের সভ্য নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সভার মাঝে বক্তৃতা দিতে হলেই মহা মুস্কিলে পড়তেন।

মুখচোরা মানুষ, কোনো আলোচনায় যোগ দেওয়াই ছিল তাঁর পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপার। মনকে বোঝাতেন সত্যনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে নীরবতাই এক মহাস্ত্র। কারণ তার ফলে অনেক মিথ্যা ভাষণ থেকে বাঁচা যায়। শেষ নয় মাস মন দিয়ে পড়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন মোহন ব্যারিস্টারি পাস করলেন। তার মানে এবার ইংল্যাণ্ডের বড় আদালতের আইনজীবীদের তালিকায় তাঁর নাম উঠল।

পরদিন-ই মোহন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবেন, তাই সেই রাতে তাঁর নিরামিষাশী বন্ধুদের বিদায়-ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। ভোজে যে বক্তৃতা দিতে হবে সেটা জানা কথা। সযত্নে বক্তৃতা লিখে নিয়ে, কষ্ট করে সেটা তিনি





মুখস্থ করে ফেললেন। কিন্তু বক্তৃতা দিতে উঠে আর মুখ থেকে কথা বেরোয় না! আমতা আমতা করতে লাগলেন। প্রথম বাক্যটিই বার বার বলতে লাগলেন। ঠাট্টা তামাসা দিয়েও কাজ চালানো গেল না। শেষ পর্যন্ত মহা অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লেন। এটা তাঁর জীবনের একটা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

সমুদ্রপথে দেশের দিকে রওনা হলেন। মনে বড় দুশ্চিন্তা। আইন পাস করেছেন, ব্যারিস্টার হয়েছেন, কিন্তু দেশে ফিরে পসার জমাতে পারবেন কি? সেখানকার আদালতেই বা ব্যবসা চালাবেন কি করে? সেখানেও তো বক্তৃতা দিতে হবে, তাও সব সময় বন্ধুবর্গের সামনে নয়। তার উপর এ দেশের আইন-কানুন কতটুকুই বা তাঁর জানা আছে?

ভাবনার চোটে বিলেতের সাফল্যের আনন্দটা ম্লান হয়ে গেল। তবু দেশে ফিরে মাকে দেখতে পাবেন, মায়ের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেটা যে রাখতে পেরেছেন একথা মাকে বলতে পারবেন, এও একটা সান্ত্বনা। মাকে তিনি বড় ভালোবাসতেন।



বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নেমেই শুনলেন মা আর ইহ-লোকে নেই। বুকটা যেন ভেঙ্গে গেল। পরে নিজেই লিখেছিলেন, "বাইরে আমি কোনো রকম শোক প্রকাশ করিনি। এমনভাবে দিন কাটাতাম যেন আমার কিছুই হয়নি। চোখের জল পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছিলাম।" বিলেতে থাকতে যে আত্ম-সংযম অভ্যাস করেছিলেন, এ তারই ফল।

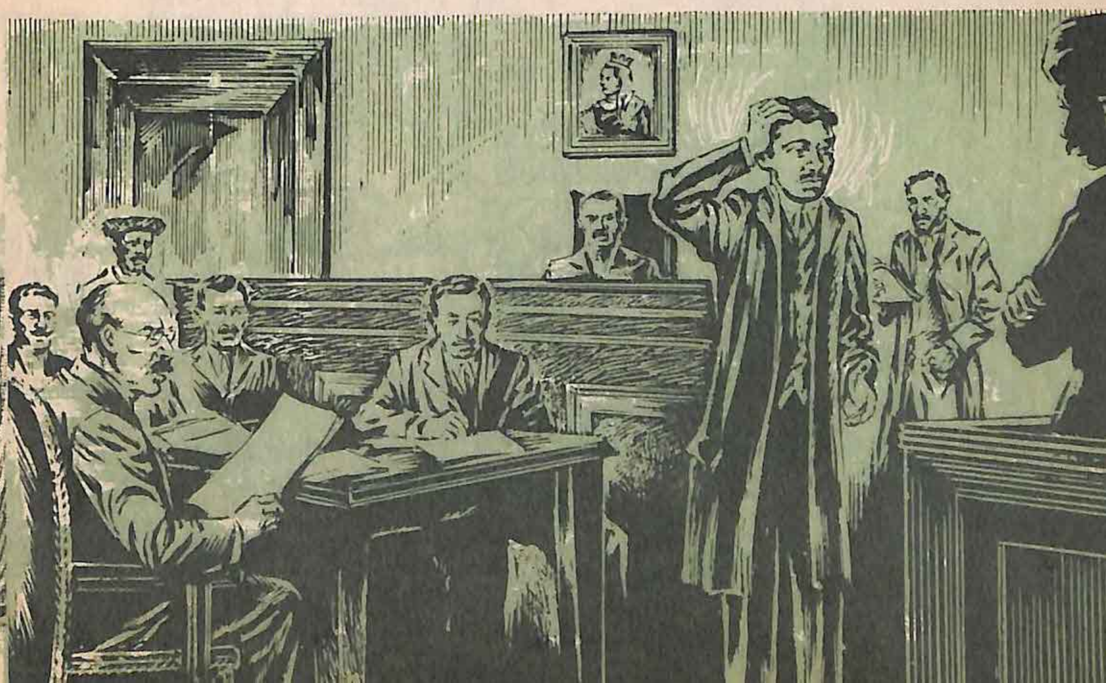


অল্প দিন রাজকোটে থেকে, বোম্বাই ফিরে এসে গান্ধী আইন ব্যবসা শুরু করলেন। তাঁর প্রথম মোকদ্দমা উঠল ছোট আদালতে। ফি পেলেন ত্রিশ টাকা।

সাক্ষীকে জেরা করবেন কি, মুখ থেকে কথাই বের হল না। কিছু বলতে আরম্ভ করতেই পারলেন না। আদালতে অস্বাভাবিক নীরবতা। এই রকম লজ্জাজনক অবস্থায় পড়ে গান্ধীজী কাঁপতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হার মেনে বসে পড়তে হল। আদালত সুদ্ধ লোক তাঁর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল।

গান্ধী রাজকোটে ফিরে এলেন। কিন্তু কপালে আরো দুঃখ ছিল। একটা মামলা নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হওয়াতে, তাঁর দাদা তাঁর সাহায্য চাইলেন। রাজকোটের ইংরেজ পলিটিকেল এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বলার দরকার ছিল।

অনিচ্ছার সঙ্গে গান্ধীজী রাজি হলেন। রাজকোটে বড়লাটের এই ইংরেজ প্রতিনিধির সঙ্গে লণ্ডনে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু এবার যখন দেখা করতে গেলেন, অতি অভদ্র ব্যবহার পেলেন। এজেন্ট কোনো



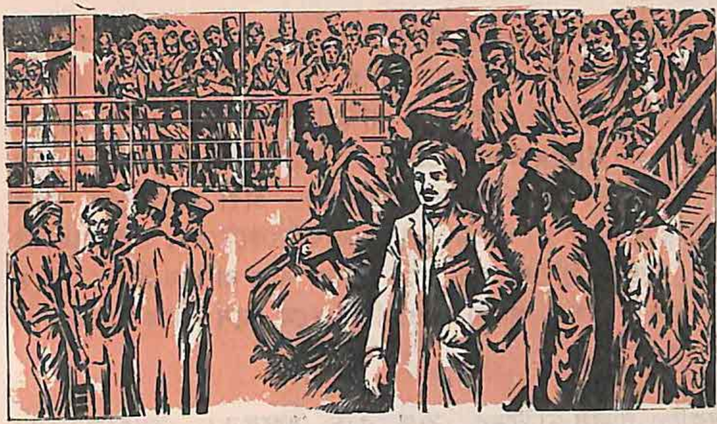
কথাই শুনলেন না। এমনকি তাঁর কথা শেষ হবার আগেই তাঁকে চলে যেতে বললেন। গান্ধীজী যখন জোর করে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে গেলেন, এজেণ্ট পিওন ডেকে তাঁকে ঠেলে ঘর থেকে বের করিয়ে দিলেন।

এই নিদারুণ অপমান থেকেই গান্ধীজীর ইংরেজ রাজের স্বরূপ বুঝতে আর বাকি রইল না। পরে এই বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, "এই ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।"

এরই ফলে যখন আফ্রিকার এক ভারতীয় কোম্পানী তাঁকে এক বছরের মতো আইন উপদেষ্টা হবার জন্যে ডাকল, তখন তিনি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, এপ্রিল মাসে জাহাজে করে বোম্বাই ছেড়ে, এক মাস পরে দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট নেটালে আবার মাটিতে পা দিলেন।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় যা দেখলেন তাতে বড় কষ্ট পেলেন। সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখা হত। তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার





করা হত। তাঁদের কোনো অধিকারই ছিল না। এমন কি, শিক্ষিত ভারতীয়দেরও দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হত না। বাদামী চামড়া যেন তাদের অসম্মানের ছাপ। অনেক সময় তাঁদের ঘৃণা করে "কুলি" বলা হত। গান্ধীজীকে বলা হত "কুলি ব্যারিস্টার।"



কর্মক্ষেত্রেও শীঘ্রই গান্ধীজী এই ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। একবার ট্রেনে প্রিটোরিয়া যাচ্ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়েছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া হল না। একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই একজন সাহেব যাত্রী উঠলেন। উঠেই গাড়িতে কালা আদমি দেখে ট্রেনের কর্মচারীদের কাছে নালিশ করলেন। তারা গান্ধীজীকে নেমে মালের ভ্যানে চড়তে বলল। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটেছেন, তাই গান্ধীজী রাজি হলেন না। তখন পুলিশ এসে তাঁকে জোর করে নামিয়ে দিল। রাত নয়টা, দারুণ শীত। সেই অবস্থায় ওয়েটিং রুমে বসে তাঁকে সারা রাত শীতে কাঁপতে হল।

পরদিন সকালে চার্লস-টাউনের স্টেজ কোচ্ ধরলেন। জোহান্সবার্গের টিকিট। কিন্তু এবারও সাহেব যাত্রী থাকাতে, তাঁকে গাড়ির উপরে গাড়োয়ানের পাশে বসে যেতে বলা হল। অশান্তির ভয়ে গান্ধীজী তাই করলেন।

একটা ষ্টেশনে একজন সাহেব তাঁকে সেখান থেকেও নামতে বলল, কারণ ঐ জায়গাটা তার চাই। গাড়ির পা-দানিতে গান্ধীজীকে বসতে বলা হল। পা-দানিতে শুধু একটা ময়লা কাপড় পাতা। এবার কিন্তু গান্ধীজী নড়লেন





না। লোকটা রেগে তাঁকে নামাতে চেষ্টা করল। মারধোর করতে লাগল। অতি বিশ্রী দৃশ্য। ভাগ্যিস অন্য যাত্রীরা বাধা দিল। গান্ধীজীকে জায়গা ছাড়তে হল না, নির্বিঘ্নে যাত্রা শেষ করলেন। এইসব দুঃখময় অভিজ্ঞতার ফলে, গান্ধীজী সঙ্কল্প করলেন আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের দুর্দশা ঘুচোতে হবে। প্রিটোরিয়া পৌঁছে তিনি স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করলেন।

গান্ধীজী বললেন তাদের সকলকে এক সঙ্গে মিলিত হতে হবে। আলাদা থাকলে অত্যাচার করা সহজ। এর ফলে ভারতীয়দের একটা সভা হল। সেখানে গান্ধীজী তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। সকলের একসঙ্গে মিলিত

হবার কথা বললেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে ব্যবসার ক্ষেত্রে সততার প্রয়োজনীয়তার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আর স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চলার কথাও বললেন।

গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন মাত্র এক বছরের জন্য, কিন্তু দেশবাসীদের মঙ্গলের জন্য তাঁর থেকে যাওয়া দরকার ভেবে রইলেন তিন বছর। যে মামলার জন্য তাঁর আফ্রিকায় যাওয়া, সেটি আপোষে মেটানো হয়েছিল। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতে তিনি বহু ভারতীয়কে সাহায্য করেছিলেন। একটা মোকদ্দমা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাল-সুন্দরম নামে একজন শ্রমিককে তার শ্বেতাঙ্গ মুনিব খুব মারধোর করেছিল। গান্ধীজীর চেষ্টায় বাল-সুন্দরমকে একজন সহৃদয় মালিকের অধীনে বদলি করে দেওয়া হল।

১৮৯৬ সালে গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। স্ত্রী পুত্রদের দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাবেন আর ওখানকার নির্যাতিত ভারতীয়দের

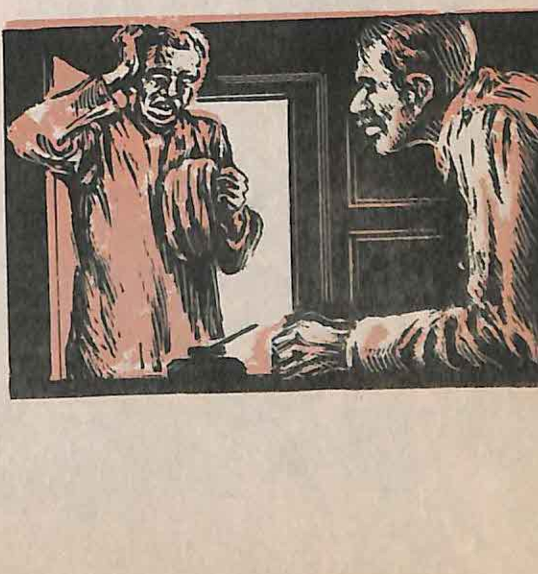




কথা দেশে প্রচার করবেন। ডিসেম্বর মাসে ডারবান থেকে জরুরী তার পেলেন, অবিলম্বে আফ্রিকায় ফিরে যেতে হবে। স্ত্রী, দুই ছেলে আর এক ভাইপোকে নিয়ে গান্ধীজী ফিরে গেলেন।

এদিকে ভারতে তাঁর বক্তৃতার খবর পেয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা বেজায় রেগে গিয়েছিল।

জাহাজ থেকে যাতে তিনি নামতে না পারেন তার চেষ্টা করেছিল। গান্ধীজী আর ৮০০ জন ভারতীয় যে দুটি জাহাজে করে ওখানে পৌঁছেছিলেন, সে-দুটিকে পঁচিশ দিন বন্দরে আটক রাখা হয়েছিল।



জাহাজের মালিক দাদা আবহুল্লা কোম্পানীকে বলা হয়েছিল ওদের দেশে ফেরত পাঠাতে। কিন্তু তাঁরা রাজি হলেন না। যখন নামবার অনুমতি দেওয়া হল, তখনো তাঁদের মারের ভয় দেখানো হয়েছিল। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন রাত হবার আগে গান্ধীজী যেন না নামেন।

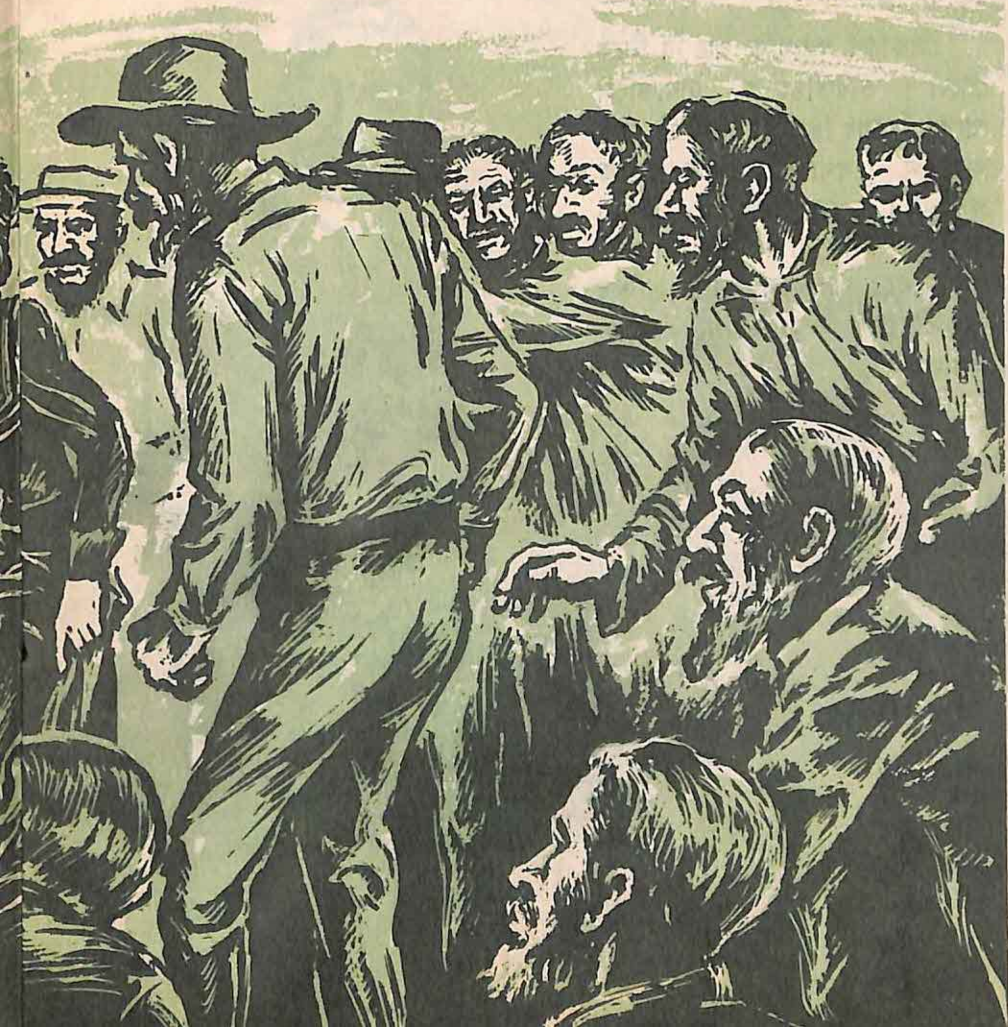
কিন্তু এভাবে নিজেকে ছোট করতে গান্ধীজী রাজি হলেন না। একজন ইউরোপীয় ব্যারিস্টার বন্ধুর সঙ্গে, দিনের আলোতেই জাহাজ থেকে নামলেন। অমনি গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা ছেলে তাঁদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। তাদের কোনো রকমে ভাগানো হল।

তারপর যেই গান্ধীজীরা এগিয়ে গেলেন, একদল লোক তাঁদের পিছু নিল। হঠাৎ একটা বিশাল-দেহ গুণ্ডা গান্ধীজীর মুখে ঘুঁষি মেরে বসল। তারপর



তাঁকে লাথি মারল। অন্যরা ঢিল ছুঁড়তে লাগল, কে যেন তাঁর পাগড়ি টেনে খুলে দিল।

আহত হয়ে, প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় গান্ধীজী একটা বাড়ির রেলিং ধরে নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডের স্ত্রী ঐ পথে যাচ্ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে চিনতেন। নিজের ছাতা খুলে গান্ধীজীকে আড়াল করে, তিনি সাহসে ভর করে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। এইভাবে তাঁরা থানায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে নিরাপদে গান্ধীজী এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।



কাজ চলতে লাগল। গান্ধীজী নেটালে ভারতীয় কংগ্রেস গড়তে লাগলেন। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের সাহায্য করতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি দেশে ফিরলেন। যাবার সময় কথা দিয়ে গেলেন যে দরকার হলে আবার আসবেন।

বাস্তবিকই ১৯০২ সালের মার্চ মাসে যখন তার এল, অমনি গান্ধীজী নিজের কথা মতো আবার আফ্রিকায় ফিরে গেলেন। তারপর বারো বছর তিনি ভারতের মাটি দেখেন নি।

সেকালে অনুমতি পত্র না নিয়ে গেলে ভারতীয়দের ট্রান্সভালে প্রবেশ নিষেধ ছিল। গান্ধীজী ঠিক করলেন সেখানে গিয়ে কাজ করবেন। জোহান্সবার্গে একটা উকীলের আপিস করলেন। সেই-খান থেকে দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত ভারতীয়দের আন্দোলন চলতে লাগল।



১৯০৬ সালের ২২শে আগষ্ট ট্র্যান্সভাল সরকার একটা বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করলেন যে আট বছর বয়সের উপরে সমস্ত ভারতীয়কে নাম রেজিষ্টারী করতে হবে। সরকারী দপ্তরে গিয়ে নাম, ঠিকানা, জাত, বয়স, পেশা ইত্যাদি লেখাতে হবে। আঙ্গুলের ছাপ আর সনাক্ত চিহ্ন দিতে হবে। সনাক্ত পত্র সর্বদা সঙ্গে রাখতে হবে, এমন কি পথে ঘাটেও। কেউ চাইলেই দেখাতে হবে। যারা এই নিয়ম অমান্য করবে, তাদের জরিমানা ও জেল হবে। তার উপর আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ভারতীয়রা ঠিক করলেন এই অপমানকর আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। জোহান্সবার্গ থিয়েটার হলে ৩০০০ ভারতীয় মিলে সভা করলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভগবানের নামে সকলে শপথ করলেন যে তাঁরা কেউ নাম রেজিষ্টারী করবেন না। এদিকে ট্র্যান্সভাল সরকার আইন চালু করবেন ঠিক করেছেন।



এই আদেশের নাম ছিল ব্ল্যাক অর্ডিন্যান্স। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিন থেকে এই আইন চালু হয়েছিল। সেদিন ভারতীয়রা দলে দলে প্রিটোরিয়ার মসজিদের ময়দানে জড়ো হয়েছিলেন। আবার তাঁরা সঙ্কল্প করলেন নাম রেজিষ্টারী করবেন না, সনাক্ত-পত্র নেবেন না।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। ট্রান্সভালের ১৩,০০০ ভারতীয়ের মধ্যে ৫০০র কম নাম রেজিষ্টারী করলেন। এটা একতার একটা সুন্দর প্রমাণ। গান্ধীজীর জয় হল।

সরকারও তার প্রতিশোধ নিতে কসুর করলেন না। ভারতীয় নেতাদের বলা হল ১৪ দিনের মধ্যে ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু তাঁরা গেলেন না। তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে আদালতে পাঠানো হল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গান্ধীজী সবচেয়ে কড়া সাজা চাইলেন। তাঁর দুই মাসের জেল হল। অল্প সময়ের মধ্যে ১৫০ জন ভারতীয় জেলে গেলেন।



এক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক তাঁদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর পরামর্শ ছাড়া তাঁরা কোনো রকম বোঝা-পড়া করতে রাজি হলেন না। জেলের মধ্যেই গান্ধীজীর কাছে একটা লিখিত চুক্তিপত্র পাঠানো হল। তাতে এই সর্ত ছিল যে ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্টারী করলে, ব্ল্যাক অর্ডিন্যান্স তুলে দেওয়া হবে। সনাক্ত-পত্রেও যা লেখা হবে, তা ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করে লেখা হবে।

এর দুদিন পরে, ট্র্যান্সভালের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা হল। জেনারেল অর্ডিন্যান্স নাকচ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গান্ধীজী কারামুক্ত হলেন। পরদিন সঙ্গীরাও ছাড়া পেলেন।

গান্ধীজী প্রিটোরিয়াতে ফিরে গেলেন। মাঝ রাতে, এক হাজার ভারতীয়র কাছে তিনি চুক্তি-পত্রের ব্যাখ্যা করলেন। তাঁদের মনে অনেক রকম আশঙ্কা ছিল। জেনারেল যদি কথা না রাখেন? নাম লেখাবার

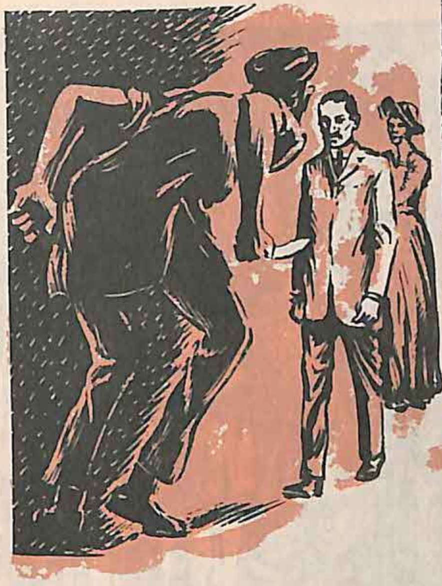


আগেই অর্ডিন্যান্সটা তুলে নেওয়া উচিত নয় কি ? গান্ধীজী বুঝিয়ে বললেন, সৌজন্যের সঙ্গে চুক্তি মেনে নেওয়াই দরকার। অনেকেই তাঁর কথায় সায় দিলেন, কিন্তু সবাই নয়।

ভোরবেলা যখন গান্ধীজী রেজিষ্ট্রি আপিসের দিকে রওনা হলেন, তিনজন পাঠান তাঁর পিছন পিছন চলল। তারপর তাঁকে ঘিরে ফেলে তারা অনেক প্রশ্ন করল। হঠাৎ একজন একটা মোটা লাঠি দিয়ে তাঁকে মারল। অন্যরাও ঘুঁষি লাথি চালাতে লাগল। গান্ধীজী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান হতেই সবার আগে তাঁর আক্রমণকারী মীর আলমকে ক্ষমা







করলেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনে তাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে এই রকম অনেক বিপদের সামনে গান্ধীজী দাঁড়িয়েছিলেন। জোহান্সবার্গে এক বিরাট সভা থেকে বেরোবার সময় একবার একটি লোককে বাইরে বারান্দার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে দেখে, গান্ধীজী কাছে গিয়ে, তাকে জড়িয়ে ধরে আগ্রহের সঙ্গে কি যেন বললেন।

লোকটা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর সে-ও কিছু বলল। কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে দুজনে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। তারপর কি একটা জিনিস গান্ধীজীর হাতে গুঁজে দিয়ে লোকটা চলে গেল। আসলে সে তাঁকে মেরে ফেলতে এসেছিল। অথচ সোজাসুজি তাঁরই হাতে ছোরাখানা দিয়ে দিল! গান্ধীজী বললেন, "গ্রেপ্তার করলে, এই লোকটি আমার শত্রু হত। এখন থেকে সে আমার বন্ধু হবে।"



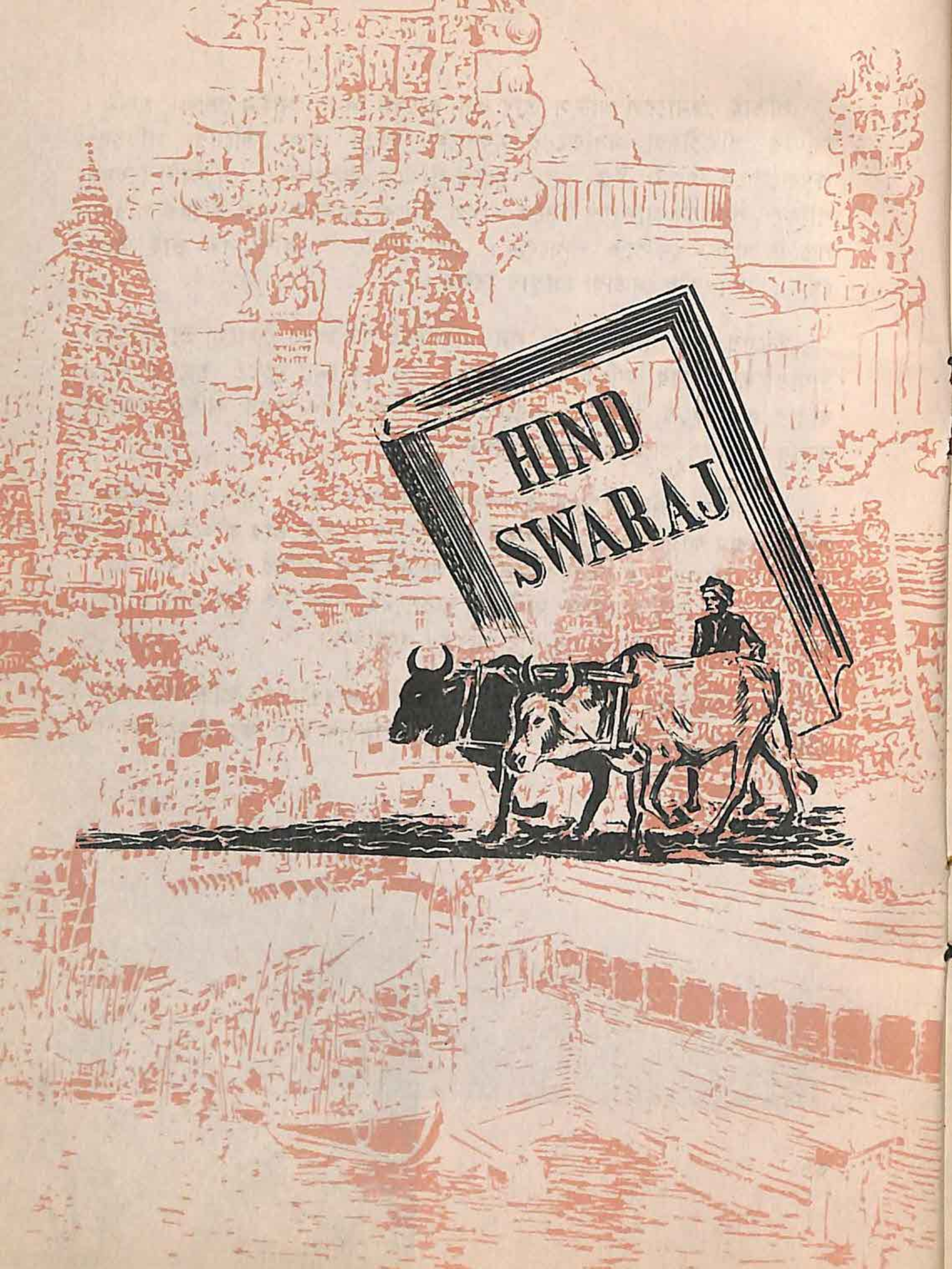
সত্যিই জেনারেল স্মাট্‌স তাঁর কথা রাখেন নি। আইন তোলা হয়নি। আবার ভারতীয়রা মসজিদের ময়দানে জড়ো হয়ে, তাঁদের পরিচয়-পত্রগুলোকে একটা মস্ত পাত্রে রেখে পুড়িয়ে ফেললেন। ধোঁয়াটা যেমন পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠতে লাগল, আরো অনেকে এসে তাঁদের পরিচয় পত্র ঐ আগুনে ফেলতে লাগলেন। দুই হাজারের বেশি পত্র ছাই হয়ে গেল। ভারতীয় নেতারা গ্রেপ্তার হলেন।

তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীও ছিলেন। পরিচয় পত্র ছাড়া কোনো ভারতীয়ের ট্রান্সভালে থাকার অধিকার রইল না। যে কোনো মুহূর্তে তাদের চলে যাবার হুকুম হতে পারত। পরদেশে বাস ও পৃথক্‌-করণ আইন অমান্য করার অপরাধে অনেকে জেলে গেলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর বেশ কয়েকবার কারাবাস হয়ে গেছিল। অনেক সময়ই সশ্রম কারাবাস। জেলের টুপি পাগড়ির মতোই তাঁর জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠল। ঐ জেলের টুপিই সম্মানের সঙ্গে বাঁচার সংগ্রামের চিহ্ন হয়ে উঠল। পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঠিক সেই রকম টুপিই গান্ধী-টুপি নাম নিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতিনিধি হয়ে গান্ধীজী ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল।




HIND
SWARAJ

ফেরার পথে জাহাজে বসেই গান্ধীজী গুজরাটিতে, হিন্দ স্বরাজ নামের বিখ্যাত বইখানি লিখলেন। এই বইয়ে ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁর নিজের মতামতের বিশদ্ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন বিদ্বেষের জায়গায় প্রেমের, হিংসার জায়গায় স্বার্থত্যাগের, পশুশক্তির জায়গায় আত্মার শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই আদর্শের পরীক্ষা হল। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে কেপের বড় আদালত হিন্দু, পার্শি ও মুসলমান মতে অনুষ্ঠিত সব বিবাহ নাকচ করে দিল। ওখানকার সরকারও সেটা সমর্থন করল। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করবেন স্থির করলেন।

সত্য ও আগ্রহ এই দুটি কথা মিলে হয়েছে সত্যাগ্রহ। ঠিক হল ট্রান্স-ভালে ভারতীয়রা শান্তিপূর্ণভাবে পদযাত্রা করে আইন অমান্য করবেন। পরিচয়-পত্র না দিয়ে ভারতীয়দের সেখানে যাওয়া বে-আইনী, গেলেই গ্রেপ্তার হতে হবে। ঠিক এইটাই তাঁরা চাইছিলেন।

২৮শে অক্টোবর বিরাট পদযাত্রা শুরু হল। সবার আগে গান্ধীজী। তাঁর পিছন পিছন ২৫০০ ভারতীয় স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে। পরনে কাপড়-চোপড় ছাড়া তাঁদের সঙ্গে শুধু একখানা করে কম্বল। আত্মসম্মান রক্ষা করতে আর দরকার হলে তার জন্যে নির্যাতন সহ্য করতে, এই শান্তিসেনা নিউকাস্‌ল্ থেকে ট্রান্সভাল অবধি ৩৬ মাইল পথ পার হলেন।



সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এর আগে এমন দৃশ্য কেউ দেখেন নি। সমস্ত পৃথিবীর লোক এঁদের সমর্থন করে সমবেদনা জানালেন।

লক্ষ লক্ষ বক্ষে তাঁদের সুশৃঙ্খল নিয়মিত পদধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগল। চার দিন হেঁটে তাঁরা ট্রান্সভালের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলেন। চতুর্থ দিনে তাঁদের গ্রেপ্তার করে, ট্রেনে চাপিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তার আগেই গান্ধীজীকে ধরে তিন মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়েছিল।

সত্যাগ্রহে যোগ দিতে ভারত থেকে আরো নেতারা এলেন।

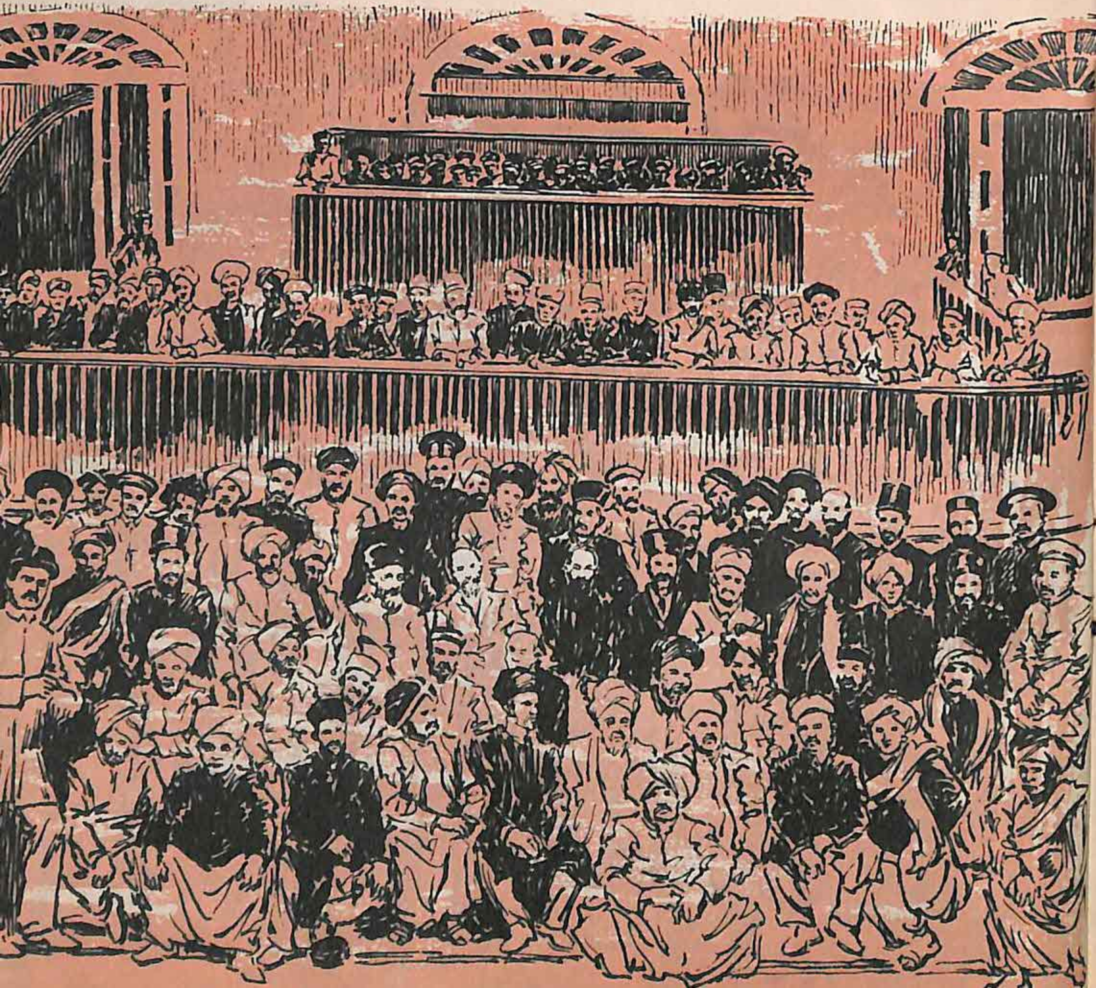


ততদিনে গান্ধীজী ছাড়া পেয়েছেন ; তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। এদিকে সরকার সমস্যার একটা সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। ভারত-বিদ্বেষী বেশ কয়জন সদস্য নিয়ে একটা কমিশন গঠন করা হল। ভারতীয়রা সেই কমিশনকে বয়কট্ করলেন। তবু ভারতীয়দেরই জয় হল। কমিশন পরামর্শ দিলেন তাঁদের সব দাবী মেনে নেওয়া হক।

আসল সংগ্রামে জয়ী হয়ে গান্ধী দেশে ফিরে আসবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।



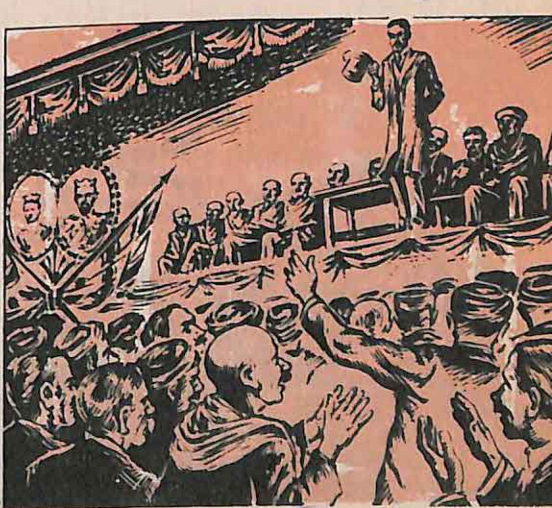
সেই সময় দেশেও মস্ত বড় পরিবর্তন ঘটছিল। ভারতের লোকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে, ক্রমে এই বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠছিল। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ঐক্যের চেষ্টা চলতে লাগল। ১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ ভারতের উন্নয়নের জন্য নেতাদের একত্রিত করে একটা সংস্থা গড়বেন ঠিক করলেন। এমন একটা সভা থাকলে, সকলে সমবেত হয়ে নানান মতামত নিয়ে সামনা-সামনি আলোচনা করা সম্ভব হয়। নানান কাজ আলাদা আলাদা ভাবে ছোট ছোট ক্ষেত্রে না করে সকলে একসঙ্গে মিলে ব্যাপকভাবে করা যাবে।



১৮৮৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হল। ভারতের নানান জায়গা থেকে, নানান ধর্মাবলম্বী ৭২ জন নেতা সভায় যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজও ছিলেন। বাংলার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ছিলেন সভাপতি। তিনদিন ধরে অধিবেশন হয়েছিল। অধিবেশনের শেষে হিউমকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে তার তিনগুণ অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।

এই সভা দেশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম দিকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস একটা বিতর্ক-সভা ছাড়া আর কিছু ছিলনা। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে ভারতের উন্নতি সাধন করা। গোড়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজ রাজাদের ছবি আর ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা এমনভাবে সাজানো হত, যাতে সকলের চোখে পড়ে। পরে গান্ধীজীর প্রেরণায় ও নেতৃত্বে এই কংগ্রেসই হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা।

ভারতবাসীদের সমস্ত সমাজের সব স্তর থেকে স্ত্রী পুরুষ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের বাণী দূর দূরান্তরের অজ পাড়াগাঁয় পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ভারতের ইতিহাসের ধারা বদলিয়ে দিয়েছিল এই কংগ্রেস।



১৯১৪ সালের ১৮ই জুলাই গান্ধীজী যখন আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন, সেখানকার হাজার হাজার ভারতীয় জলভরা চোখে তাঁকে সস্নেহে বিদায় দিয়েছিলেন। সে দেশে এর আগে এমন দৃশ্য কেউ দেখে নি।

গান্ধীজী সোজা দেশে ফেরেন নি। কয়েকদিন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন।

তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য বোম্বাইয়ে অনেকগুলি সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল। এরই একটিতে জিন্না তাঁকে স্বাগত জানিয়ে, উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তারপর অনেক মাস ধরে গান্ধীজী ভারত ভ্রমণ করলেন। তীর্থস্থানে গিয়ে তিনি পুরোহিত, ব্যবসায়ী, ভিখারি, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। সর্বদা ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া-আসা করতেন, গরীবদের দুঃখ কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করতেন।

এর পর গান্ধী স্থির করলেন অনুচরদের নিয়ে একটা আশ্রম করে সেখানেই থাকবেন।





১৯১৫ সালের ২৫শে মে আমেদাবাদের কাছে কোচরাব বলে একটা ছোট গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হল। এক বছর পরে সেটাকে সবরমতী নদীর তীরে আরেকটা গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এ জায়গাটাও আমেদা-বাদের কাছে।

যাঁরা ঐ আশ্রমে থাকতে এলেন, তাঁদের প্রত্যেককে কথা দিতে হল যে তাঁরা সর্বদা সত্যবাদী, অহিংস ও নির্ভীক হবেন আর অত্যন্ত কঠোর আত্ম-সংযম পালন করবেন। খুব সাদাসিধা ভাবে তাঁদের থাকতে হত। আশ্রমের এলাকার মধ্যেই তাঁরা কাজ করতেন। পড়শীরা যা দিতেন, সেটুকুই তাঁরা গ্রহণ করতেন।

আশ্রমে ২৫ জন স্ত্রী পুরুষ ছিলেন। একসঙ্গে এক পরিবারের মতো তাঁরা থাকতেন। এখানেই চরখার সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। পরে তিনি লিখেছিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আমি কখনো চরখা জিনিসটি চোখে দেখি নি।" একজন বিধবা গুজরাটি আশ্রমবাসিনী তাঁকে একটা চরখা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী পরম আগ্রহে খাদি বুনতে শিখলেন।

কয়েক মাস পরে গান্ধীজী এক অস্পৃশ্য পরিবারকে আশ্রমে এনে রাখলেন। লোকটির নাম দুধাভাই, স্ত্রীর নাম দানিবেন, তাদের ছোট্ট মেয়েটির নাম লক্ষ্মী।

এই ব্যাপারে গ্রামের গোঁড়া হিন্দুরা বিচলিত হলেন ও বেজায় রেগে গেলেন। তাঁরা আশ্রমকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করলেন। তবু গান্ধীজী সেই অস্পৃশ্য পরিবারকে ত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন। অন্যায় কাজ করার চেয়ে বরং তিনি আশ্রম বন্ধ করে দিতে রাজি ছিলেন।

শেষটা অবস্থা এমন হল যে আশ্রম আর চলে না। গান্ধীজী আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার জোগাড় করছেন, এমন সময় প্রায় অচেনা একজন ধনী লোক মোটরে করে আশ্রমে এসে, গান্ধীজীর হাতে নগদ ১৩ হাজার টাকা দিলেন। আশ্রম রক্ষা পেল।

জনসাধারণের সঙ্গে গান্ধীজী সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন। কারখানা বা ক্ষেত-খামারের শ্রমিকদের যদি কখনো মনে হত যে তাদের উপর অবিচার



করা হয়েছে, তারা অমনি প্রতিকারের জন্য তাঁর সাহায্য চাইত। তিনি তাদের বলতেন যে সত্য নিষ্ঠার বড় দরকার। যারা সত্যকে আশ্রয় করে সংগ্রাম করে, তারা প্রচণ্ড শক্তিলাভ করে।

বিহারের চম্পারণ থেকে যখন ডাক এল, তিনি সেখানে গেলেন। সরকার থেকে জেলা ছেড়ে যাবার আদেশ এলে, তিনি কান দিলেন না। বিচারের জন্য কোর্ট থেকে সমন এল। আদালত লোকে লোকারণ্য। অবস্থা বুঝে সরকারের মোকদ্দমা চালাবার এতটুকু ইচ্ছা রইল না। গান্ধীজী অপরাধ স্বীকার করা সত্ত্বেও মোকদ্দমা মুলতুবি হল। পরে মামলা তুলে দেওয়া হল।

সরকারের অনুসন্ধান কমিটি শ্রমিকদের পক্ষেই রায় দিয়ে ছিলেন। আরেকবার সংগ্রামে গান্ধীজীর জয় হল। গান্ধীজী এইভাবে যেখানেই দরকার হত, গিয়ে সাহায্য করতেন।





নিজেকে তিনি এতটুকু রেহাই দিতেন না। নানা রকম কষ্ট সহ্য করতেন। একবার তাঁর আমাশা হল। গুজরাটের নাদিয়াদে যখন পৌঁছলেন, তখন তাঁর খুব জ্বর ও পেট বেদনা। শরীর আরো খারাপ হলে, বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। বই পড়বার বা কথা বলবার শক্তি ছিল না। কিছু খেতেন না, ওষুধ তো নয়-ই। দুধ পর্যন্ত খেতে রাজি হলেন না। কয়েক বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন গোরুর দুধ কখনো খাবেন না, কারণ আমাদের দেশের লোকরা গোরুর যত্ন করে না।

গান্ধীজীর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই ভাবিত হয়ে উঠলেন। তখন কস্তুরবা একটী উপায় ঠাওরালেন। গান্ধীজী গোরুর দুধ ছেড়েছেন বটে, কিন্তু ছাগলের দুধ তো খেতে পারেন। খানিক ভেবে গান্ধীজী ছাগলের দুধ খেতে রাজি হলেন। তার ফলে শক্তিও ফিরে পেলেন, রোগও দূর হল। সেই সময় থেকে ছাগলের দুধ তাঁর আহারের একটী অবশ্য উপকরণ হয়ে গেল।

গান্ধীজীর অসুখ সেরে আসছে, এমন সময় রাউলাট আইন পাশ হল। এতে ভারতীয়দের ব্যক্তি-স্বাধীনতা আরো কমিয়ে দেওয়া হল। বিনা বিচারে কারাবাসের ব্যবস্থা হল। শরীর তখনো দুর্বল, তবু গান্ধীজী মাদ্রাজ গেলেন। আইনটার বিরুদ্ধে কি ভাবে লড়া যায়, সেই বিষয়ে পরামর্শ করা দরকার।

শ্রী রাজাগোপালাচারীর বাড়ীতে এক রাতে এই বিষয়ে ভাবতে ভাবতে গান্ধীজী ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন পূর্ণ হরতালের। সত্যাগ্রহের জন্য মনকে শুদ্ধ করা চাই। গান্ধীজী বললেন সব ভারতবাসী এক দিনের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করে, সারা দিন উপবাস ও উপাসনায় কাটাক।

এর পর ১৯১৯ সালের হরতালগুলি খুব সফল হয়ে ছিল। অবিশ্যি কোথাও মার-পিট হয়েছিল, অনেক লোক মারাও গিয়েছিল।



গান্ধীজী দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হলেন না। গান্ধীজীর গতিবিধি সীমাবদ্ধ করা হল, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হল। পাঞ্জাবে তাঁর প্রবেশ নিষেধ ছিল। সেখানে তখন প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল।

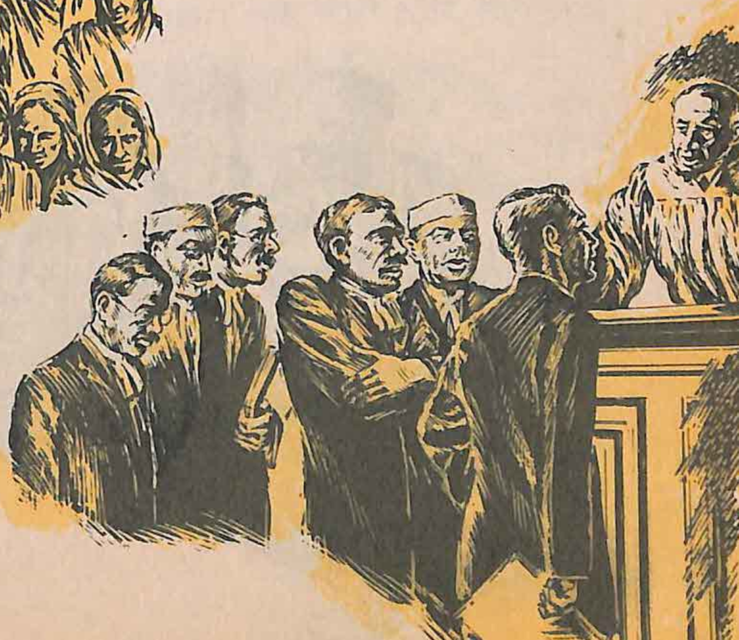
অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটী সভার আয়োজন হয়েছিল। জেনারেল ডায়ার সভা বন্ধ করার হুকুম দিলেন। কেউ শোনে নি। জনতা যখন পার্কের মধ্যে জড়ো হয়েছে, তখন হঠাৎ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে ডায়ার এসে উপস্থিত। তাঁরা এসে প্রবেশ পথ দখল করে, ত্রিশ সেকণ্ডের মধ্যে, কাউকে কিছু না বলে, গুলি চালাতে লাগলেন। দশ মিনিট গুলি চলল। পালাবার পথ ছিল না। পালাবার চেষ্টায় একটা কূয়োয় পড়ে অনেকের প্রাণ গেল। ১২০০ লোক মারা গেল, ৩৬০০ আহত হল।

তারপর পাঞ্জাবে কঠোর দমন নীতি চালু হল। সামান্য অপরাধে চাবুক, অপমান। গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের উপর বিশ্বাস হারালেন।



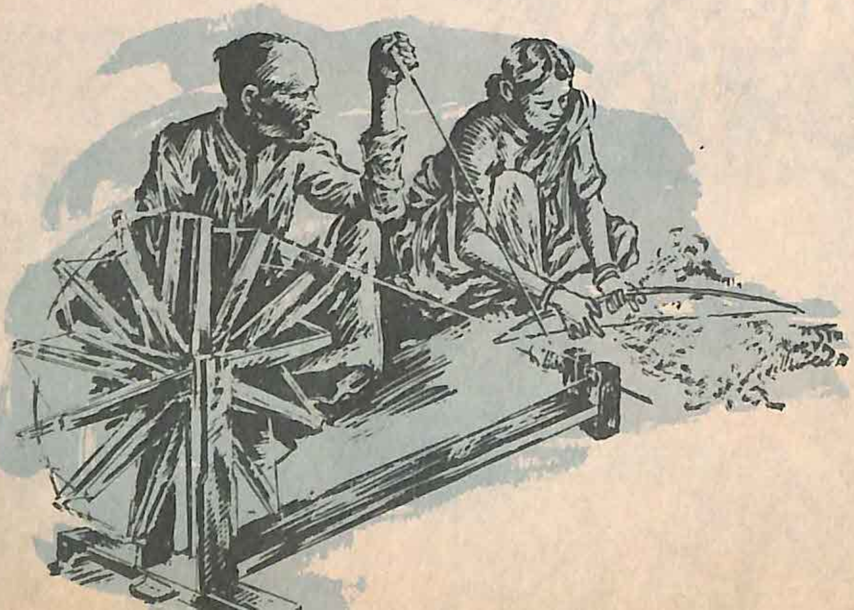


তিনি দেশবাসীদের জানালেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ হবে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে, জনসাধারণকে এবার সর্বান্তঃকরণে তাঁর সব কাজে যোগ দিতে হবে। তারপর থেকে হরতাল, মিছিল, ধর্মঘট চলতে লাগল, কিন্তু সবই অ-হিংস ভাবে। আন্দোলনের মূল কথা ছিল, "আইনতঃ স্বাধীনতা অর্জন"। এবার এই নীতি আরো বিস্তৃত করে বলা হল "আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা অর্জন।" উকিলরা ব্যবসা ছাড়লেন। পঞ্চায়েতগুলো আদালতের স্থান নিল।





গান্ধীজী বলতেন স্কুল কলেজগুলো হল চাকুরে আর কেরাণী তৈরির কারখানা। ছাত্ররা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবে বলে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিল। গান্ধী টুপি আর হাতে কাটা সূতোয় হাতে বোনা খাদি যেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্ম হয়ে দাঁড়াল। ভারতের মুক্তির প্রতীক হল চরখা। বছরের মধ্যে কয়েকমাস বেকার হয়ে কিষাণরা বসে থাকত। চরখা তাদের কাজ দিল, তাতে যত সামান্য-ই উপায় হক না কেন। চরখা-ই ভারতকে বিদেশী কাপড়ের উপর নির্ভর করা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

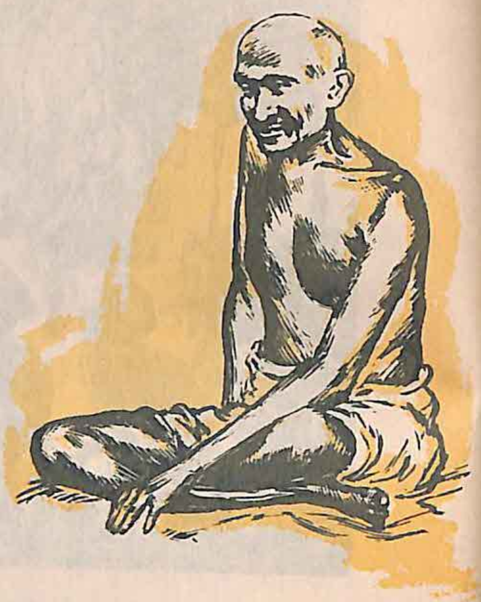




গান্ধীজী জানতেন কি করে জনতাকে আকর্ষণ করতে হয়। সহজভাবে তাদের চেনা দৃষ্টান্ত দিয়ে, তাদের-ই ভাষায়, তিনি নিরক্ষর জনতার কাছে নিজের বাণী প্রচার করতে পেরেছিলেন। এই জন্যেই সবাই তাঁকে সমর্থন করত।

বোম্বাইয়ে বিদেশী মিলে তৈরি কাপড় পুড়িয়ে এক বিরাট অগ্নি উৎসবের আয়োজন করে, তিনি জনতাকে বোঝালেন বিদেশী বস্ত্র ভারতের গৃহ-শিল্পকে নষ্ট করে দিচ্ছে। হাজার হাজার লোক সেই দৃশ্য দেখতে এসেছিল। আগুনের শিখা কাপড়ের গাদাকে ঘিরে উঁচু হয়ে উঠল। লোকদের আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ ভরে উঠল। পরে এই ঘটনার কথা মনে করে গান্ধীজী লিখেছিলেন, "স্বদেশী আন্দোলনের এই ব্যাপারটি যেমন গভীর ভাবে দেশবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তেমন আর অন্য কোনো ব্যাপারে সম্ভব হয় নি। বিদেশী কাপড় পরা পাপ। নিজের বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে ফেললে, নিজের লজ্জাকেও পোড়ানো হয়।"

শুধু একটা কৌপীন পরে গান্ধীজী ভারতের জনসাধারণের, ভারতের কৃষকদের প্রতিনিধি হলেন। তাঁর গলা থেকে ভারতের সাধারণ লোকদের ভাষা শোনা গেল। এই প্রথম এ দেশের জনসাধারণ রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হল।



স্বদেশী আন্দোলন সফল হয়েছিল। গান্ধীজী নিজেও রোজ চরখা কাটতেন, দেশ-



বাসীদেরও কাটতে বলতেন। দেখতে দেখতে ভারতের গ্রামগুলিতে ২০ লক্ষ চরখার গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। বস্ত্রের ক্ষেত্রে চরখা হল আমাদের স্বাবলম্বনের চিহ্ন।



অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন চলতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সময় এল যখন আন্দোলন আর অহিংস রইল না। তখন গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তবু গান্ধীজীর সম্পাদনায় ইয়ং ইণ্ডিয়াতে যে সব সমালোচনা বেরুত, তার জন্য ১৯২২ সালের মার্চ মাসে, তাঁকে সবরমতী জেলে বন্দী করা হল। আমেদাবাদের আদালতে তাঁর বিচার শুরু হল।

ক্ষীণ-দেহ, শান্ত মূর্তি গান্ধীজী, পুরু একটী কৌপীন পরে যখন আদালতে এলেন, তখন সেই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলে উঠে দাঁড়ালেন। মোকদ্দমা শুরু হল। গান্ধীজী সরকারের কর্ম পদ্ধতির নিন্দা করে বললেন, এ পদ্ধতি অসৎ। খোলাখুলি তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য করেছেন, কিন্তু অহিংস ভাবে করেছেন। গান্ধীজীর ছয় বছরের কারাদণ্ড হল।

এই মোকদ্দমা এমন ভাবে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যে সরকার আর কখনো খোলা আদালতে গান্ধীজীর বিচারের চেষ্টা করেন নি।

শোনা যায় জেলে বসে তিনি যে আত্ম-জীবনী লিখেছিলেন, সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীর মধ্যে গণ্য। জেলে পড়াশুনার প্রচুর অবসর ছিল। তিনি সেই সময়টাকে ভালো কাজেই লাগিয়েছিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গান্ধীজী জ্বর ও পেট ব্যথা নিয়ে বড় অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

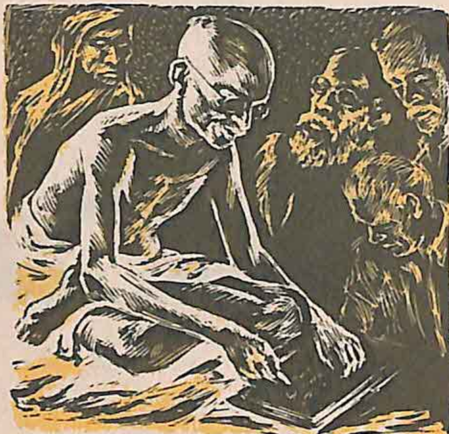




অবস্থা শঙ্কা-জনক হলে তাঁকে পুনার হাস্পাতালে নিয়ে যাওয়া হল। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের অস্ত্র হল। আলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, লণ্ঠনের আলোতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। আরোগ্যলাভের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন ১৯২৪ সালের মার্চ মাস।

বোম্বাইয়ের কাছে জুহুর সমুদ্র তীরে একটি ছোট বাংলোতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। সবে সেরে উঠেছেন, এমন সময় দেশের নানান জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল। শরীর দুর্বল, তবু গান্ধীজী স্থির করলেন ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১ দিন উপবাস করবেন। এই উপবাস হবে দেশবাসীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।



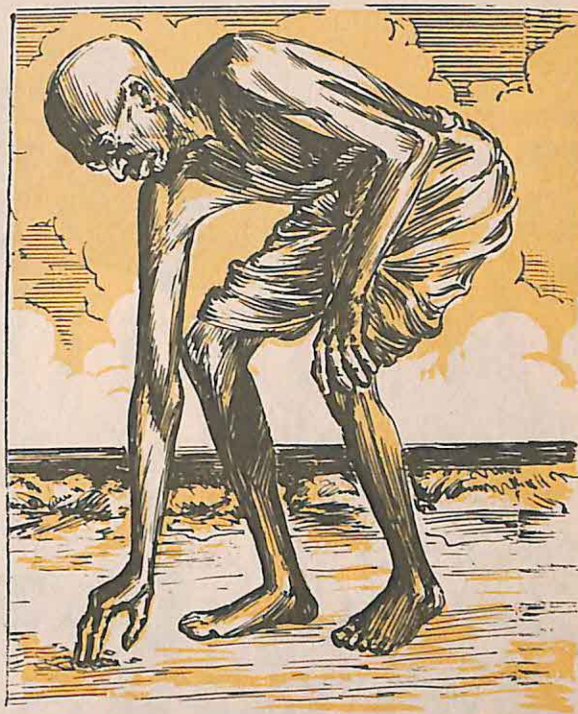
এর পর গান্ধীজী নানান গঠনমূলক কাজে মন দিলেন। কিন্তু সরকারের কার্য-কলাপ ক্রমাগত তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। নানান বিষয়ে তাঁকে জন-সাধরণকে পরামর্শ দিতে হত। তিনি সর্বদা তাদের স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে বলতেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারকে লবণ আইন তুলে দিতে বললেন। নুন এমন একটি জিনিষ, যা নইলে কারো চলেনা। লবণ শুল্ক গরীবদের উপরেই বেশি চাপ দেয়। সুতরাং এটাকে তুলে দিলে গরীবরাই সব চেয়ে উপকৃত হবে।

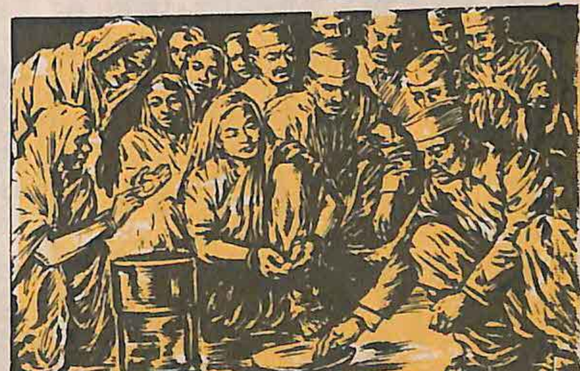
সরকার কিন্তু রাজি হলেন না। কাজেই গান্ধীজীও প্রকাশ্যে এই আইন ভাঙ্গবেন বলে ঘোষণা করলেন। সমুদ্রের ধারে ডাণ্ডি বলে একটি গ্রাম আছে, আশ্রম থেকে গ্রামটি ২০০ মাইল দূরে। লবণ আইন ভঙ্গের জন্য গান্ধীজী এই গ্রামটি বেছে নিলেন।

১২ই মার্চ ভোরে সাড়ে ছটার সময় ডাণ্ডি অবধি পদযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। মুখে মৃদু হাসি, হাতে লাঠি, কোমল চোখ দুটিতে দৃঢ়তা। সঙ্গে আশ্রমের ৭৯ জন সহচর। সকলে প্রতিজ্ঞা করলেন লবণ শুল্ক না উঠে যাওয়া পর্যন্ত কেউ আশ্রমে ফিরবেন না। যাত্রা শুরু হল।

এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক পদযাত্রা দেখতে আর তাঁদের নির্ভীক নেতাকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। ঐ মানুষটি পৃথিবীর কোনো শক্তিকেই ডরাতেন না। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে পদযাত্রায় যোগ দিলেন।



নেহরুও কিছুকাল ওঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। এই যাত্রার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "তাঁকে দেখলাম লাঠি হাতে সবার আগে চলেছেন। দৃঢ় পদক্ষেপ, চোখের দৃষ্টি শান্ত কিন্তু ভয়শূন্য। সে দৃশ্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।"









২৪ দিন পরে তাঁরা ডাণ্ডির সমুদ্র-তীরে পৌছলেন। সে দিন ছিল ৫ই এপ্রিল। সকলে রাত কাটালেন উপবাস ও উপাসনায়। ভোরে সবাই সমুদ্রে স্নান করলেন। গান্ধীজী নিচু হয়ে এক টুকরো নুন তুলে নিলেন। এই সামান্য কাজটিতেই আইন অমান্য করা হল। সমবেত জনতা জয়-ধ্বনি করে উঠলেন। সত্যাগ্রহীদের মন আনন্দে ভরে গেল।

উত্তেজিত হয়ে সরোজিনী নাইডু গান্ধীজীকে অভিনন্দন করে বলে উঠলেন, "জয় মুক্তিদাতা।"

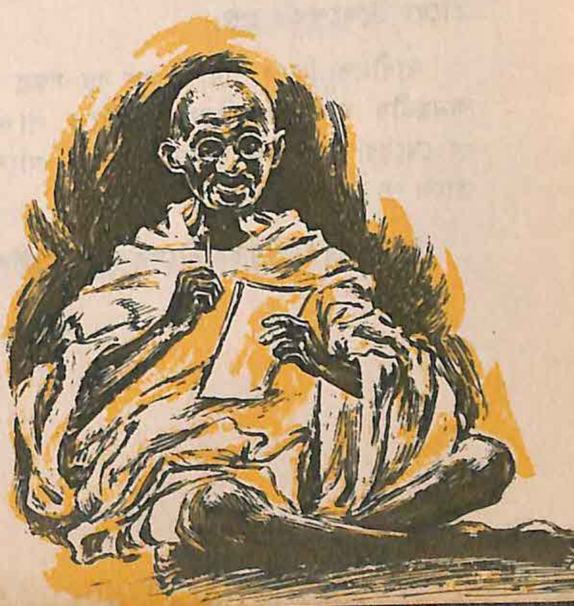
সমস্ত দেশটাই যেন এই ইঙ্গিতটুকুর জন্যে প্রতীক্ষা করেছিল। সমস্ত শহরে গ্রামে স্ত্রী পুরুষ নুন তৈরি করে বিক্রি করতে লাগল। কেউ শুল্ক দিল না। ৪ঠা মে সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে যারবেদা জেলে বন্দী করে রাখলেন। তখন সরোজিনী নাইডু লবণ সত্যাগ্রহের ভার নিলেন।

গান্ধীজীর ধারাসানায় যাবার ইচ্ছা ছিল। শ্রীমতী নাইডু সে ইচ্ছা কাজে পরিণত করলেন। তাঁর নেতৃত্বে ২৫০০ অহিংস স্বেচ্ছাসেবক ধারাসানা লবণ কেন্দ্রে হানা দিলেন। নুনের কড়াইগুলো কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ছিল। তার চারদিকে নালা। ৪০০ জন পুলিস লাঠি নিয়ে, ২৫ জন বন্দুক নিয়ে খাড়া ছিল।

বেড়া থেকে কিছু দূরে সত্যাগ্রহীরা দাঁড়ালেন। তারপর নালার ভিতর দিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার দিকে এক দল এগিয়ে গেলেন। পুলিসরা তেড়ে এসে, লোহা বাঁধানো লাঠি দিয়ে তাঁদের মাথায় মারতে লাগল।

কেউ হাত তুলে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না। হাত পা এলিয়ে তাঁরা মাটিতে পড়ে গেলেন। কেউ জ্ঞান হারালেন, কেউ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। কারো মাথার, কারো কাঁধের হাড় ভাঙ্গল। পরনের সাদা কাপড়চোপড় রক্তে লাল হয়ে গেল।

পদযাত্রীদের মধ্যে এতটুকু ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। একদল মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই, আরেক দল এগিয়ে গেলেন। সংগ্রাম, প্রতিরোধ, বা নিজেদের বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই নেই। লাঠির ঘায়ে মাটিতে না পড়া অবধি, দলের পর দল এগিয়ে যেতে লাগলেন।





সরকারের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের ফলে, সমস্ত দেশ বিরূপ হয়ে উঠল।

সত্যাগ্রহীদের সাহস ও অহিংস আচরণ আর যেভাবে তাঁরা নীরবে নির্যাতন সহ্য করলেন, এতটুকু প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না, তাই দেখে সকলের মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। সে শ্রদ্ধা শুধু সত্যাগ্রহীদের জন্য নয়, তাঁদের উদ্দেশ্যেরও জন্য।

স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প ভারতবাসীদের মনে শান্ত অথচ অনমনীয় সাহসের পরিচয় চারদিকে পাওয়া যেতে লাগল। যুগ যুগ ধরে যে-মেয়েরা ঘরে বন্ধ ছিলেন, তাঁরাও আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এলেন।

তখন থেকে ভারতবাসীদের কাছে ব্রিটিশ শাসন অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

এই পর্যায়ে প্রকাশিত বই।

বাপু (সচিত্র জীবনী—দুই খণ্ড)	এফ. সি. ফ্রীটস
কাশ্মীর	চিত্রশিল্পী : প্রেমানন্দ শর্ম্মা লেখিকা : মালা সিংহ
পক্ষী জগৎ	জমাল আরা
নদী কথা	লীলা মজুমদার
হিমালয়ের চূড়োয় চূড়োয়	ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংহ
স্বর্গে যাত্রা ও অন্যান্য গল্প	লীলাবতী ভাগত
সরস গল্প	মনোজ দাস
স্বরাজ্যের কথা—১ম ভাগ	বিষ্ণু প্রভাকর
আমাদের রেলপথ	জগজিৎ সিংহ
ভারতে বিদেশী যাত্রী	কে. সি. খান্না

প্রত্যেকটি বইয়ের দাম ১.৫০

এইসব বই ইংরেজি ও সব ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়

